দৈনিক
ইনকিলাব

22 MAY 2017

এমাজউদ্দীন আহমদ

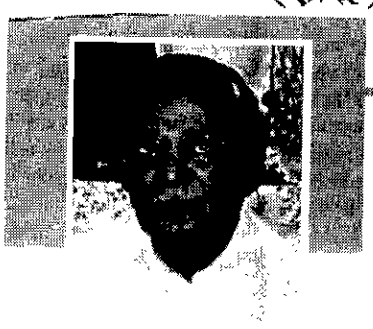

শিক্ষা : জাতিসত্তার আবেদন

বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থা বেহাল অবস্থায় রয়েছে। এটি না সনাতন, না আধুনিক। বাংলাদেশের শিক্ষায় না আছে ব্যক্তিত্ব গঠনের সূত্র, নেই জাতিগঠনের চিৎশক্তিও। বিভিন্ন কালের সংগৃহীত উপাদানসমূহের আলগা সংযোজনে গড়ে ওঠা এক কিম্ভূতকিমাকার ব্যবস্থা এটি। হিন্দু ভারতের টোল-চতুষ্পাঠীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে মুসলিম ভারতের মক্তব-মাদ্রাসা এবং তার সঙ্গে আলগাভাবে জড়িত হয়েছে ব্রিটিশ ভারতের সাধারণ শিক্ষা। এই শিক্ষা সকলকে এক সূত্রে গ্রথিত করে না। সবার জন্যে মিলনের ক্ষেত্রও রচে না। বরং সবাই যেন ভিন্ন অবস্থানে অনড় থাকে তার ব্যবস্থা পাকা করেছে

ব্রিটিশ দার্শনিক বার্ট্র্যান্ড রাসেলের মতে, আধুনিককালে কোনো জনপদে শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে তিনটি ভিন্ন মতবাদ প্রচলিত রয়েছে। প্রথম মতবাদে বলা হয়, শিক্ষার লক্ষ্য হলো ব্যক্তির শ্রীবৃদ্ধির জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা এবং এজন্য ব্যক্তির পথের সকল বাধা-প্রতিবন্ধকতাগুলো অপসারণ করা। দ্বিতীয় মতবাদে বলা হয়, শিক্ষার লক্ষ্য হলো ব্যক্তিকে সংস্কৃতিবান এবং রুচিশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। তৃতীয় মতবাদে বলা হয়, শিক্ষাকে ব্যক্তিগত সৌকর্য বৃদ্ধি নয়, বরং সার্বিকভাবে সমগ্র সম্প্রদায়ের শ্রীবৃদ্ধির মাধ্যম হিসাবে দেখা উচিত যেন শিক্ষার মাধ্যমে জনসমষ্টি যোগ্য এবং দক্ষ নাগরিক হিসাবে গড়ে ওঠে। এই তিনটি মতবাদের মধ্যে প্রথমটি হলো সর্বাধুনিক এবং তৃতীয়টি সবচেয়ে পুরনো। তার মতে, কোনো জনপদে শিক্ষাব্যবস্থা সুবিন্যস্ত করার জন্য এই তিনটির কোনো একটি স্বতন্ত্রভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বরং তিনটি থেকে বাছাই করা মূল্যবান উপাদানগুলোর সুচিন্তিত সুসমঞ্জস ব্যবস্থাই হলো শিক্ষা।

ব্যক্তির শ্রীবৃদ্ধি না ঘটলে সামাজিক অগ্রগতির পথ সুগম হবে কীভাবে? জ্ঞানের মর্যাদা এবং পরিশ্রমের মূল্য দিতে না শিখলে অর্জন আসবে কীভাবে? অশ্বকে যথাযথভাবে প্রশিক্ষিত করতে হলে যেমন প্রয়োজন চাবুক, শিশু-কিশোরদের শিক্ষণ-প্রশিক্ষণের জন্য তেমনি প্রয়োজন শিক্ষার ছড়িটি। এজন্য বিশ্বের সর্বত্র একটি পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলকভাবে দেবার ব্যবস্থা রয়েছে। জ্ঞান আহরণের আকাঙ্ক্ষা খুব স্বাভাবিক বটে, বিশেষ করে তরুণ-তরুণীদের মধ্যে, কিন্তু যদি শিক্ষাদান বা জ্ঞান-দানের প্রক্রিয়া শিক্ষার্থীদের আকাঙ্ক্ষার অতিরিক্ত হয় অথবা যদি যারা তা গ্রহণ করবে তার চেয়ে বেশি হয় তাহলে ফল হবে উল্টো। যেসব শিশুকে জোর করে খাওয়ানো হয় তাদের মধ্যে খাবারের প্রতি অনীহা সৃষ্টি হবেই। অন্য কথায়, শিক্ষাদান এবং শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে নেই কোনো জায়গা জোর-জবরদস্তির, কোনো জায়গা নেই আতিশয্যের, অপ্রয়োজনীয় কোনো বাহুল্যের।

মানব জীবনকে সহজ, সরল, সুন্দর, স্বাভাবিক এবং আনন্দময় করে তুলতে হলে, তা মানুষের ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্যের ক্ষেত্রেই হোক আর বৈশ্বিক পর্যায়ে সামষ্টিক জীবনের বহুমাত্রিক কর্মক্ষেত্রেই হোক, তাহলে রাসেলের মতে, 'প্রয়োজন হয় দু'ধরনের প্রীতিকর সমন্বয় অথবা সুষমতা'। তার নিজের কথায়, "If a man's life is to be satistactory, whether from his own point of view or from that of the world at large, it requires two kinds of harmony."। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে প্রয়োজন হবে 'বুদ্ধি, আবেগ এবং ইচ্ছার সুষমতা এবং বাহ্যিক ক্ষেত্রে অন্যদের আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছার সুষমতা'। শিক্ষা অথবা সুশিক্ষার লক্ষ্য হলো এইটিই। রাসেলের এই বক্তব্যের সঙ্গে আমার শুধু ছোট্ট একটা সংযোজন রয়েছে। বুদ্ধি, আবেগ এবং ইচ্ছার সঙ্গে মানবতাবোধের সংযোজন ঘটিয়ে এবং তার সঙ্গে সততা এবং উদারতার আলোয় মানব মনকে আলোকিত করার আদর্শিক অঙ্গীকারের আবেশ মাখিয়ে দিলে যে কোনো জনপদে শিক্ষা শুধু যে অর্থপূর্ণ হয়ে উঠবে তাই নয়, ব্যক্তিকে ব্যক্তিত্বের ঊর্ধ্বে তুলে সমাজ ও জাতিসত্তা, এমনকী তারও ঊর্ধ্বে সামগ্রিকভাবে বিশ্বমানবতার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত করা সহজ হয়। এভাবে সৃষ্টিকর্তার শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি মানুষ চূড়ান্ত পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়।

শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে এমন চিন্তা-ভাবনা তো স্বপ্ন। এর বাস্তবায়ন আপনা-আপনি ঘটবে না। মানব সভ্যতার প্রভাতকাল থেকেই এ সম্পর্কে ভাবনা-চিন্তা হচ্ছে। এই ধারা এখনো অব্যাহত রয়েছে। সর্বজনগ্রাহ্য শিক্ষা ব্যবস্থা এখনো রয়েছে স্বপ্নে। এই স্বপ্ন আর কতদিন দেখব? এই স্বপ্ন সত্যি করতে ভাবতে হবে। অনেক ভাবনা-চিন্তা করতে হবে।

শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আমাদের সংবিধানে যা লিপিবদ্ধ হয়েছে, তাও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদে লিখিত রয়েছে: 'রাষ্ট্র (ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য..... কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।' এদিকে তাকিয়েও আমরা পরিপূর্ণ শিক্ষার কথা ভাবতে পারি। তার পূর্বে কিন্তু পরিপূর্ণ জীবনের দিকেও তাকাতে পারি।

বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থা বেহাল অবস্থায় রয়েছে। এটি না সনাতন, না আধুনিক। বাংলাদেশের শিক্ষায় না আছে ব্যক্তিত্ব গঠনের সূত্র, নেই জাতিগঠনের চিৎশক্তিও। বিভিন্ন কালের সংগৃহীত উপাদানসমূহের আলগা সংযোজনে গড়ে ওঠা এক কিম্ভূতকিমাকার ব্যবস্থা এটি। হিন্দু ভারতের টোল-চতুষ্পাঠীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে মুসলিম ভারতের মক্তব-মাদ্রাসা এবং তার সঙ্গে আলগাভাবে জড়িত হয়েছে ব্রিটিশ ভারতের সাধারণ শিক্ষা। এই শিক্ষা সকলকে এক সূত্রে গ্রথিত করে না। সবার জন্যে মিলনের ক্ষেত্রও রচে না। বরং সবাই যেন ভিন্ন অবস্থানে অনড় থাকে তার ব্যবস্থা পাকা করেছে। এই শিক্ষা না উচ্চারণ করে সহযোগিতার মন্ত্র, না সৃজন করে আত্মার বন্ধন। এটি খণ্ডছিন্ন, বিভেদসূচক, নিরানন্দ। আমাদের দেশের শিক্ষা একদিকে যেমন প্রাণহীন, অন্যদিকে তেমনি গতিশীল জীবনের জন্যে অর্থহীন। তাই উচ্চতর ডিগ্রিধারী এবং অর্ধ-শিক্ষিতদের কেউ কোনো সৃজনশীল উদ্যোগে এখন পর্যন্ত তেমন সফল হলো না, কেননা এদের কাউকে সৃজনশীলতার জাদু স্পর্শ করতে পারেনি। শিক্ষিত হয়েও অনেকে প্রশিক্ষিত মনের অধিকারী হতে পারেননি।

১৮৩৫ সালে লর্ড মেকলে (Macauley) কর্তৃক প্রবর্তিত শিক্ষানীতি ফারসির পরিবর্তে ইংরেজি এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের অন্যান্য ধারা বর্জন করে সাধারণ শিক্ষার অন্তর্ভুক্তি ছিল এই নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। ভারতশাসনে এই অঞ্চলে উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে তাদের সহায়ক এবং সমর্থক গোষ্ঠীতে রূপান্তরিত করাই ছিল এই শিক্ষানীতির মূল লক্ষ্য। মেকলের নিজের কথায়: 'এই মুহূর্তে এমন এক শ্রেণি সৃষ্টির ক্ষেত্রে আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে যে শ্রেণি আমাদের এবং লক্ষ লক্ষ শাসিতদের মধ্যে ব্যাখ্যাকারীর ভূমিকা পালন করবে। এই শ্রেণি এমন এক শ্রেণি হবে যারা রক্তে ও বর্ণে হবে ভারতীয়, কিন্তু রুচি, অভিমত, নীতিবোধ ও বুদ্ধিবৃত্তিতে হবে ইংরেজ'। তখন থেকে এদেশে আসে স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি প্রভৃতি শব্দ। ইংরেজির মাধ্যমে লেখাপড়া শিখে সরকারি চাকরি লাভ, ব্যবসা-বাণিজ্যে অগ্রগতি অর্জন প্রভৃতি লোভনীয় ক্ষেত্রে আকৃষ্ট হয় সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ। ইংরেজির মাধ্যমে সাধারণ শিক্ষার প্রসার ঘটতে থাকে দ্রুত। এক্ষেত্রে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে অসংখ্য মিশনারি গ্রুপের ইংরেজিতে পাঠদান সহায়তা করে ভীষণভাবে। ব্রিটিশ শাসকদের প্রবর্তিত এই শিক্ষানীতির প্রেক্ষাপটও উল্লেখযোগ্য। ভারতশাসনের জন্যে প্রয়োজন ছিল ভারতীয়দের আচার-আচরণ, নীতি-নৈতিকতা, ইতিহাস-ঐতিহ্য, নিয়ম-পদ্ধতি সম্পর্কে সজ্ঞাত হওয়া। এই লক্ষ্যে সরকার কলকাতায় ১৭৮১ সালে প্রতিষ্ঠা করে হিন্দু কলেজ এবং কলকাতা মাদ্রাসা। প্রসঙ্গত এই দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলো এই অঞ্চলে সর্বপ্রথম সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। অন্যান্য ছাত্রের সাথে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরাও যেমন এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভ করতে পারে সেই লক্ষ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এ দুটি প্রতিষ্ঠান। ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যও তাই ছিল। হিন্দু কলেজ বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত পর্বে প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তরিত হয়, কিন্তু কলকাতা মাদ্রাসা অবহেলা, বঞ্চনা, উপেক্ষার কারণে স্থবির হয়ে থাকে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসারূপে। একদিকে মুসলমানদের দারিদ্র্য, অন্যদিকে কিছু নেতৃস্থানীয় মুসলিম নেতার ব্রিটিশ শাসনের প্রতি ঘৃণাজনিত সাধারণ শিক্ষার প্রতি অনীহা সরকারি মাদ্রাসা তথা দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত মাদ্রাসাগুলোকে রক্ষণশীল, সংকীর্ণ এবং যুগের অনুপযোগী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে ফেলে। অন্যদিকে সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রটি ক্রমে ক্রমে উর্বর হতে থাকে। স্কুল থেকে কলেজ, কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় এবং এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আধুনিকতার আলোয় জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারার চর্চা হতে শুরু করে। লর্ড মেকলের সেই লক্ষ্য অর্জিত হয় বটে, সাথে সাথে সাধারণ স্থবিরতা আজও কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

একুশ শতকে কিন্তু প্রতিযোগিতা হবে মেধার, পেশির নয়। এই প্রতিযোগিতা হবে মননের, সৃজনশীলতার—বাচালতার নয়। এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হতে হলে প্রয়োজন হবে সৃষ্টিশীল মস্তিষ্কের, বিরাট বপুর নয়। প্রয়োজন হবে উদার অন্তঃকরণের, বুকভরা হিংসা বা প্রতিহিংসার নয়। আমার মনে হয়েছে, দেশে যে শিক্ষা চালু রয়েছে, বর্তমানের জন্য আংশিকভাবে তা ফলপ্রসূ হলেও ভবিষ্যতের জন্য, বিশেষ করে এই শতকের মহাসমারোহে মর্যাদার সঙ্গে টিকে থাকার জন্য তা মোটেই উপযোগী নয়। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে নির্দিষ্ট পাঠক্রম সাধারণ ভাবনা-চিন্তার দুর্গে প্রবেশ করার জন্য উপযোগী হলেও যে দুর্গ আত্মরক্ষা এবং নিরাপত্তার দুর্ভেদ্য কেন্দ্র রূপে চিহ্নিত, সেখানে প্রবেশাধিকার দান করবে না। এজন্যই শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার অপরিহার্য।

শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার অপরিহার্য হলেও এ সম্পর্কে সুচিন্তিত পরিকল্পনা প্রণয়ন কিন্তু এখন পর্যন্ত যথেষ্ট নয়। এজন্য প্রয়োজন জাতির সার্বিক প্রস্তুতি। প্রয়োজন জাতির রাজনৈতিক দৃঢ় সঙ্কল্প। এদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি এমনি যে, ক্ষমতাসীন দল শুধুমাত্র দলীয় ব্যক্তিদের মাধ্যমেই শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় বিষয়ে নীতি প্রণয়ন করতে চেয়েছেন। অন্যান্য দেশে এই দায়িত্ব দেওয়া হয় বিশেষজ্ঞদের ওপর। তাছাড়া আরো একটি কারণে বাংলাদেশে শিক্ষানীতি কোনোদিন বাস্তবায়িত হয়নি। গত ৪৬ বছরে কোনো সরকার শিক্ষা কার্যক্রমকে কোনো সময়ে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার রূপে গ্রহণ করেনি। কয়েকটি দিকে তাকালে তা সুস্পষ্ট হবে। এক. কোনো সরকারের আমলে যথেষ্ট অভিজ্ঞ ও গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োগ দেওয়া হয়নি। ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়, কিন্তু সাধারণভাবে দেখা গেছে, কাউকে মন্ত্রী করতে হবে অথচ তার জন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ পোর্টফোলিও পাওয়া যাচ্ছে না, তখন তাকে শিক্ষামন্ত্রী করা হলো। দুই. বাংলাদেশে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ সব সময় হয়েছে অতি অল্প। বেশ কয়েক বছর থেকে একটু বেড়েছে বটে, কিন্তু জাতীয় পর্যায়ে মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য যা প্রয়োজন তার ধারেকাছে কোনোদিন এই বিনিয়োগ আসেনি। কোনো উন্নত দেশের দিকে না তাকিয়ে যদি আমরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর দিকে তাকাই তাহলেই চলবে। যে ক্ষেত্রে ঐসব দেশে মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ৪ দশমিক ৫ থেকে ৫ ভাগ শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যয় করছে, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যয় করছে শতকরা ২ ভাগের মতো। যে উচ্চ শিক্ষা সমগ্র শিক্ষা ক্ষেত্রটিকে প্রণোদিত করে থাকে সেক্ষেত্রে বিনিয়োগ একেবারেই অপ্রতুল। তাই বলি, অতীতে প্রণীত শিক্ষানীতি যে বাস্তবায়িত হয়নি তা পীড়াদায়ক নিশ্চয়ই, কিন্তু তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রও তৈরি হয়নি কোনো সময়। তাছাড়া, যখনই কোনো আন্দোলনের সূচনা হয় দেশে, তখন সেই আন্দোলনের প্রথম শিকার হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কোনো রাজনৈতিক দল বা সংগঠন এক্ষেত্রে সংযম প্রদর্শন করেনি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিজের মতো চলতে দেয়নি।

মানবজীবনকে আমরা দ্বি-মাত্রিক প্রত্যয় হিসাবে দেখতে পারি। এর একটা দিক হলো প্রায়োগিক বা বাহ্যিক বা জৈবিক। এই পর্যায়ে সফল হতে হলে যে শিক্ষার প্রয়োজন হয় তা দক্ষতা অর্জনের, কোনো পেশা গ্রহণ করতে চাইলে সেজন্যে সর্বোতভাবে প্রস্তুত হবার, প্রকৃতির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার, সকল কর্ম নৈপুণ্যের সাথে সম্পন্ন করার, সমাজ ব্যবস্থাকে মানুষের উপযোগী করার। এসব ক্ষেত্রে দক্ষতা, সক্ষমতা, নৈপুণ্য হলো একরাশি মণিকাঞ্চন। এজন্যে তরুণ-তরুণীদের শিখতে হবে বিজ্ঞানের হাজারো সূত্র, প্রযুক্তির হাজারো প্রকরণ। জানতে হবে সমাজ জীবনের অসংখ্য নীতি অথবা দুর্নীতির গ্রন্থি সম্পর্কে। দেশে প্রচলিত সাধারণ শিক্ষার কর্মসূচিতে যেভাবে ভূগোল, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, তথ্যপ্রযুক্তি, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, চিকিৎসা শাস্ত্র, ব্যবহার বিজ্ঞান বা আইন সংযুক্ত হয়েছে তা এই লক্ষ্যেই।

মানব জীবনের আর একটি প্রত্যয় হলো মানসিক অথবা আত্মিক। জীবনের এই দুই মাত্রার সুষম বৃদ্ধি হলেই শুধু জীবন হয় পরিপূর্ণ। আত্মিক প্রত্যয়কে অপরিণত রেখে কেউ যদি প্রায়োগিক মাত্রার শ্রীবৃদ্ধিতে মনোযোগী হয় অর্থাৎ পার্থিব জীবনের জন্যে দক্ষতা, নৈপুণ্য, সক্ষমতা অর্জন করে তাহলে সে হয়ে উঠবে অহংকারী, ক্ষমতালিপ্সু, স্বার্থপর, লোভী। অন্যদিকে শুধুমাত্র আত্মিক প্রত্যয় সুদৃঢ় হলে এবং পার্থিব জীবনের জন্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণে ব্যর্থ হলে সে হয়ে উঠবে পরনির্ভরশীল, হীনম্মন্য, নির্দয়, ষড়যন্ত্রপ্রিয়। তাই জীবনকে পরিপূর্ণ করার জন্যে শিক্ষা হতে হবে একদিকে যেমন পার্থিব বা প্রায়োগিক প্রত্যয়কে শক্তিশালী করার মাধ্যমে, তেমনি আত্মিক বা মানসিক উন্নয়নের বাহনও। আত্মিক বা মানসিক প্রত্যয়ের জন্যে প্রয়োজন ধর্ম শিক্ষা, নৈতিকতার পাঠ গ্রহণ, সংস্কৃতি চর্চা, ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি অনুধাবন যেন মানুষের মন হয় উদার, সুরুচিসম্পন্ন, সুনীতি সমৃদ্ধ, পরিশীলিত। আমাদের দেশে মানুষকে দক্ষ, কর্মচঞ্চল, সক্ষম করার জন্যে সাধারণ শিক্ষা এক ধরনের ভূমিকা পালন করে চলেছে। ধর্ম শিক্ষাও আত্মিক প্রত্যয়কে সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু দুই স্রোতধারা এখনো প্রবাহিত হচ্ছে স্বতন্ত্রভাবে, অনেকটা সমান্তরাল গতিতে রেলের দুটি লাইনের মতো। চলছে পাশাপাশি, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে সুনির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে। এটি কোনোক্রমে কাম্য নয়। সমাজ জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে শিক্ষাকে অর্থপূর্ণ করতে হলে এই দুই ধারার সম্মিলন একান্তভাবে প্রয়োজন। বাংলাদেশের মাটিকে উর্বর, সবুজ শস্যশ্যামল, ফলপ্রসূ করতে পদ্মা-যমুনা-মেঘনার সম্মিলিত স্রোতধারা যা করেছে আমাদের নতুন প্রজন্মকে সৃজনমুখী, সৃষ্টিশীল করতে, তাদের মধ্যে বিশ্বজয়ের উদগ্র আকাঙ্ক্ষার অনুপ্রবেশ ঘটাতে, আকাশছোঁয়া উদারতার আলোয় তাদের উদ্ভাসিত করতে তেমনি প্রয়োজন সাধারণ শিক্ষাকে ধর্মীয় শিক্ষার সাথে সম্মিলিত করে সমাজব্যাপী নতুন জীবনবোধ সৃষ্টি করা যেন দক্ষতার সাথে সততা, নৈপুণ্যের সাথে পবিত্রতা বিশেষ করে সক্ষমতার সাথে সহিষ্ণুতার বিকাশ ঘটে এবং বাংলাদেশ হয়ে ওঠে সুশিক্ষার এক আদর্শ স্বর্ণদ্বীপ।

● **লেখক:** সাবেক উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়